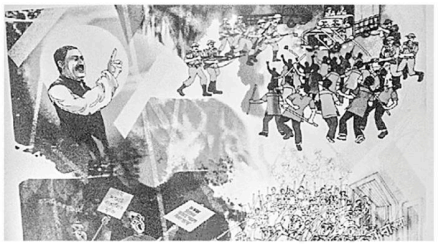

দৈনিক বাংলা

মঙ্গলবার, ২৬ মার্চ, ২০২৪

স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু

আবদুস সামাদ ফারুক

স্বাধীনতা মানুষের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা। মানুষ জন্মসূত্রেই স্বাধীন কিন্তু জীবন পরিচালনায় সম্মুখীন হয় অজস্র বাধার। মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারায় লক্ষ করি মানুষের বেঁচে থাকার প্রত্যাশা দুধে-ভাতে, ডাল-ভাতে কখনো বা মোটা কাপড়, মোটা ভাতে।

বঙ্গ নামের এই বদ্বীপ দেশে মানুষ বারংবার মাথা উচুঁ করে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। তবে তাদের ওপর নেমে এসেছে নিগ্রহ ও নির্যাতন, বহিঃশক্তির ঔপনিবেশিক শাসন এবং অন্তহীন শোষণ। এই শাসন-শোষণে জড়িত রাজা বাদশা থেকে জমিদার, তালুকদার শ্রেণি এবং ব্রিটিশ বেনিয়া কোম্পানি পর্যন্ত। এই দুঃসহ নিগর থেকে মুক্তির জন্য মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা বহু সংগ্রাম এমনকি যুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছে। তাই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় একই আকাঙ্ক্ষার অনুরণন:

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৬০ সাল থেকে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ১৭৯৩ সালে তা শেষ হয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ। কোম্পানির শাসন এবং তাদের তল্পীবাহক জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে নারকেলবাড়িয়ার তিতুমীরের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হাজী শরিয়তউল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, মাষ্টার দা সূর্যসেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা, বাঘা যতিনের সংগ্রাম ও আত্মহুতি ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলেও বাঙালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ধূলিস্যাৎ হতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঙালি নেতা শেরে-বাংলা এ.কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উজ্জ্বল ভূমিকা থাকলেও এবং এই জনপদের মানুষের ঐকান্তিক সমর্থন সত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি চির বঞ্চিত রয়ে যায়।

প্রথমেই আসে ভাষার প্রশ্ন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাষা হবে উর্দু এ ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পূর্ববঙ্গের তরুণ ছাত্রসমাজ পাকিস্তানি নেতাদের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু শৈশব হতেই একজন মানবহিতৈষী মানুষ। তার পূর্বপুরুষ শেখ আবদুল আউয়াল ধর্মপ্রচারের জন্য এ দেশে আসেন এবং এক পর্যায়ে পূর্বপুরুষগণ টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কিশোর শেখ মুজিব নিজের পিতার গোলার ধান পড়শীদের অকাতরে বিলিয়ে দেন। পাশাপাশি শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনচেতা ও সাহসী।

১৯৩৪ সালে ১৪ বছর বয়সে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। কলকাতার ডা. টি আহম্মদের তত্বাবধানে চোখে অপারেশন করেন। তিন বছর তার লেখাপড়া বন্ধ ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী আবদুল হামিদ মাষ্টার তার গৃহ শিক্ষক ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন।

১৯৩৮ সালে ১৬ জানুয়ারি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের ছাদ থেকে পানি পড়া এবং ছাত্রাবাসের সমস্যা তুলে ধরেন কিশোর শেখ মুজিব। ফলশ্রুতিতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। বাংলার প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের দাবী করা তাঁর সাহসিকতার একটি অনন্য পরিচয় বহন করে।

১৯৩৯ সালে তিনি মুসলিম লীগ গোপালগঞ্জ শাখার ডিফেন্স কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বেকার হোষ্টেলে বাস করেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদান করেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ত্রাণ কর্মকাণ্ডে জড়িত হন।

১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কলকাতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন । ২৩ ফেব্রয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ‘পূর্ব পাকিস্থানের জনগন উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মেনে নিবে’ বলে ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১১মার্চ বাংলা ভাষার দাবীতে ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে জরিমানা করেন। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি এবং মহিউদ্দিন আহমদ এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানান ও প্রতিবাদ করেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৬ মে মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবি করেন, ২১ দফা ঘোষণা করা হয়।

২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু, “পূর্ব পাকিস্তান” নামের পরিবর্তে পূর্ব বাংলা প্রদেশকে ”বাংলা” নামে ডাকার অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে ”বাংলা” শব্দটার সাথে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সারাজীবন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে “মুসলিম” শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম করা হয় আওয়ামী লীগ। সে বছর তিনি দলের পুনরায় সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মন্ত্রিত্বের চেয়ে দলবড় এবং রাজনীতি বড় এই সত্যের রূপায়ন দেখি ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মধ্যে।

১৯৫৮ সালে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে একের পর এক মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়।

১৯৬০ সাল থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু গোপন সংগঠন “স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ” গঠন করেন। মহকুমা ও থানা পর্যায়ে কাজ শুরু করেন।

১৯৬২ সালে শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী’র নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়।

১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৪ সালে ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি বয়স্ক নাগরিকের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ১৪দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৫ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য দেয়ার মামলা দায়ের হয়।

১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ৬ দফার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক নিম্নে পেশ করা হলো:-

(১) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্র। পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হবে, যা হবে সার্বভৌম। এই আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(২) পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে যথা: দেশরক্ষা ও বৈদেশিক। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে।

(৩) সমগ্র দেশে দুইটি পৃথক এবং সহজে একটি বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

(৪) কর ও শুল্ক ধার্যের বিষয় অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বর্হিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করা হবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলির এখতিয়ার ভুক্ত হবে।

(৬) আঞ্চলিক সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে আধা-সামরিক ও আঞ্চলিক সেনাবাহিনি গঠন ও রাখার ক্ষমতা থাকবে।

৬ দফার বিষয়গুলি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বুঝা যায় যে, স্বাধীনতার মৌলিক কাঠামোগুলির মধ্যে রয়েছে যা একটি সাবভৌম রাষ্ট্র গঠনের দিকে ধাবমান। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে ১৮ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে তাকে আটক করা হয়। ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ১৪৪ ধারা ও কারফিউ বঙ্গ, পুলিশ ইপিআরের গুলিবর্ষণে বহু প্রাণ হতাহত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করেন। আইয়ুব খান ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি গোল টেবিল বৈঠক ডাকে। বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

২৫ মার্চ, ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২য় বার পাকিস্তান সামরিক শাসন জারী করে।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নাম করেন “বাংলাদেশ”।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের পুনরায় সভাপতি হন। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু দলের নির্বাচনী প্রতীক “নৌকা” ঘোষণা করেন।

২৮ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে বিজয়ী করার অনুরোধ করেন।

৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ১৬৭টি আসন প্রাপ্ত হন।

প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসন অর্জন করেন ১৯৭১ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্যাদের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন।

১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর বয়কটের ঘোষণায় তা স্থগিত করা হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, ভুট্টো সাহেবের কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান।

৭ মার্চ বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মাহেন্দ্র ক্ষণ। এ রকম উত্তাল ঝঞ্ঝা মুখরদিন বাঙালি কখনো দেখেনি। দশ লক্ষ জনতা সেদিন উপস্থিত রেসকোর্স ময়দানে।

কবি নির্মলেন্দু গুনের ভাষায়:-

‘শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জন সমুদ্রে জাগিল জোয়ার।
সকল দুয়ার খোলা, কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতা খানি:
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

৭ মার্চে মূলত: স্বাধীনতার এক প্রকার ঘোষণা হয়ে গেল।

সারা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণায় অমিত তেজে জেগে উঠলো।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে রয়েছে বঞ্চনার ইতিহাস, রয়েছে সামরিক দিক, অর্থনৈতিক দিক এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি, বাংগালীর স্বপ্ন বুনোনের নকশা।

অবাঙালিদের প্রতি যেন কোনো অন্যায় না করা হয় সেই মানবিক নির্দেশনাও ছিল জাতির পিতার সেই ভাষণে।

জাতিসংঘের **Unesco** এই ভাষণকে **বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য** হিসেবে এ স্বীকৃতি দেয়। যুক্তরাষ্টের নিউজ উইক পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি হিসেবে ঘোষণা করেন।

প্রায় ২৫,০০০ বছর ধরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সমাজ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত যে সব শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে এই ভাষণটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে অন্যান্য দীপ্তিময়তা। এই ভাষণ বাঙালিকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কবি নজরুলের ‘বল বীর বল চির উন্নত মম শীর’ এর প্রার্থিত সেই বীর পুরুষ বঙ্গবন্ধু, এই ভাষণে তা বাঙময় হয়ে ওঠে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের:-

“ওই মহা মানব আসে
দিকে দেকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরালোকে বেজে উঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক।
এল মহাজন্মের লগ্ন।”

বিশ্ব কবির এই চিরন্তন প্রার্থনা স্বার্থক হয় ৭ই মার্চের ভাষণের ভাষ্যকার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু।

তারপর কয়েকদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আলোচনার ছলনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের কালো রাত্রে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অগনন মানুষকে হত্যা করে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোটার্সে।

২৫ শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

পাক হানাদার বাহিনীর শেষ সৈন্যকে বিতারিত না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

প্রায় দশ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। লাল সবুজের পাতাকা খচিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যূদয় হয়। হাজার বছরের লড়াই সংগ্রামের সুবর্ণ ফসল বিমূর্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার নেতৃত্ব দিলেও বঙ্গবন্ধুর নামে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তেজ ও শক্তিতে প্রতিজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবনপণ লড়াই করেন। দেশের অগনন সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন দান করেন এবং সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হন।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমান বন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্সের দশ লক্ষ জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন।

১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

নতুন স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত এবং সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ তিনি শুরু করেন। আমরা দেখতে পাই যে বাঙালির স্বাধিকার বা স্বায়ত্ব শাসনের জন্য অনেক জাতীয় নেতা সোচ্চার হয়ে ইতিহাসের অনন্য গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখলেও অসীম সাহসের সাথে বঙ্গবন্ধু প্রথম বার স্বাধীনতার কথা বলেন এবং তার নেতৃত্বে তা অর্জিত হয়।

কাজেই বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা এই শব্দ দুটো একসূত্রে গাঁথা। আজ আমরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে কাজ করছি, অথচ এই স্বাধীনতা ও স্বাধীন দেশ হিসেবে একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সাধনার হিরন্ময় বাস্তবায়ন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়তু বাংলাদেশ।

লেখক: সাবেক সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।